অমর জীবনের কিছু কথা

কে এম মাহমুদুল হাসান

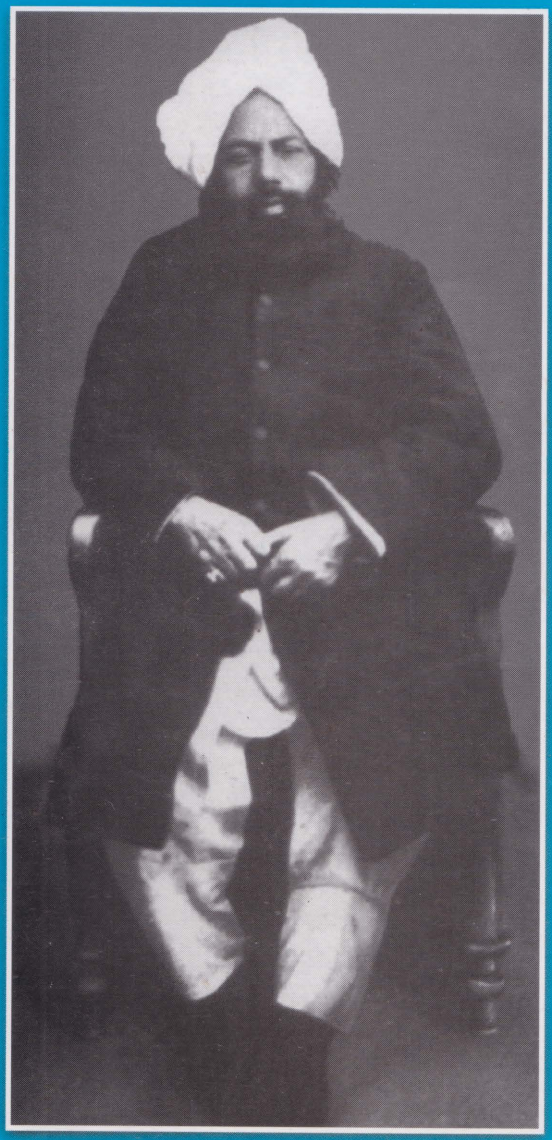

অমর জীবনের কিছু কথা

কে এম মাহমুদুল হাসান

প্রকাশক	লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
লেখক	কে এম মাহমুদুল হাসান
প্রথম প্রকাশ	জুলাই, ১৯৯১ খ্রিঃ
২য় সংস্করণ	অক্টোবর, ১৯৯১ খ্রিঃ
৩য় সংস্করণ	সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ
সংখ্যা	৫০০ কপি
মুদ্রণ	ইন্টারকন এসোসিয়েটস ৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Amor Ziboner Kicchu Katha

অমর জীবনের কিছু কথা

By
K. M. Mahmudul Hassan

Published by:
Lajna Imaillah, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بسم الله الرحمن الرحيم

"অমর জীবনের কিছু কথা" শিরোনামে কে এম মাহমুদুল হাসানের লেখাগুলো পড়ে দেখলাম। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশের জন্যে অনুমতি প্রদান করা গেল।

লেখাগুলো পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আশা করি এগুলো পাঠকদের জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস হবে। লেখকের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। দিন দিন তার কলম জোরদার হউক মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই দোয়া করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা ১৩-০৭-৯১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

২য় সংস্করণের ভূমিকা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে জনাব কে এম মাহমুদুল হাসান লিখিত "অমর জীবনের কিছু কথা" পুস্তকটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই পুস্তকটির সব কপি শেষ হয়ে যাওয়াতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পুস্তকটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। পুস্তকটির চাহিদা কত বেশি তাও এ থেকে অনুমান করা যায়। প্রথম সংস্করণের ভূলগুলো ২য় সংস্করণে প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে, কিছু সংযোজনও করা হয়েছে। আশা করি এদেশের শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনে পুস্তকটি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান আল্লাহ্ এই প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করুণ। আমীন।

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া
বাংলাদেশ।

ঢাকা ১৫-১০-৯১ ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৩য় সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় জামা'তে আহমদীয়ার শিশু-কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী শিক্ষামূলক পুস্তক নাই বললেই চলে। জনাব কে এম মাহমুদুল হাসান রচিত 'অমর জীবনের কিছু কথা' পুস্তকটি কিছুটা হলেও বাচ্চাদের চরিত্র গঠনে বিশেষ অবদান রাখবে। লেখক অতি সহজ ও সুন্দর করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) সহ কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ ছোটদের উপযোগী করে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নাসেরাতুল আহমদীয়ার ছোট সোনামণিদের হাতে তুলে দেবার লক্ষ্যে লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ পুস্তকটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করছে।

পুস্তিকাটি প্রকাশনার ব্যাপারে লেখকসহ প্রুফ রিডিং এবং মুদ্রণে যে যেভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলকেই মহান আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন। (আমীন)

রওশন জাহান
সদর
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ।

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ইং

সূচিপত্র

ধারাক্রম	শিরোণাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ	৭
২.	খোদার পাহ্‌লওয়ান	১১
৩.	মাহমুদ নামের ছেলেটি	১৬
৪.	খোদার দয়া	২০
৫.	ক্রীতদাস থেকে নেতা	২৫
৬.	সেরা ছেলের সেরা মা	২৯
৭.	প্রেম ও সহমর্মিতা	৩২
৮.	ভালবাসা ও আনুগত্য	৩৪

بسم الله الرحمن الرحيم

জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ

আজ তোমাদের এমন একজনের কথা বলব যিনি ছিলেন এজগতের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে জন্মলাভকারী সব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ভালোবাসতেন সবাইকে। কাউকেই তিনি ঘৃণা করতেন না। কারো মনেই কষ্ট দিতেন না। কাউকেই কখনো গালি দিতেন না। কারো ওপরেই কখনো অত্যাচার করেন নি। জীবনে কোনদিন তিনি মিথ্যা বলেন নি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ– এই দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল মানুষ।

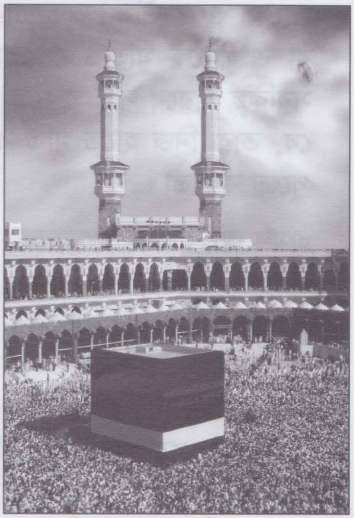

কা'বা শরীফ

এই শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্ম হয়েছিল আরব দেশে। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। তোমরা জান, ঘুটঘুটে আঁধারেই প্রয়োজন হয় তীব্র আলোর। আরবের লোকেরা সেযুগে গভীর আঁধারে নিমজ্জিত ছিল। সেটি কেমন আঁধার? সে দেশে কি সূর্য উঠত না? হ্যাঁ, সকালে পূর্বদিকে সূর্য উঠে বিকেলের শেষে ঠিকই ডুবে যেত পশ্চিমে। কিন্তু তাদের মন ছিল আঁধারে ঢাকা। মনের ভেতরে কোন আলো ছিল না। তাই তারা জ্ঞানী হতে পারে নি। মুর্খই থেকে গিয়েছিল। কিসে ভাল আর কিসে মন্দ তা না বুঝে শুধুই খারাপ কাজ করতো। এমনকি, বাবা তার আদরের মেয়েকে জীবন্ত মাটির নীচে পুঁতে ফেলতো। তারা ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বছরের পর বছর একটানা যুদ্ধ করতো। একটি মাদী উটকে প্রহার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনই এক যুদ্ধ বেধেছিল বনু বকর ও বনু তাগলিব গোত্রের মধ্যে। এ যুদ্ধটি চলেছিল একটানা চল্লিশ বছর। কত লোক যে মরেছিল তার কোন ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধটির নাম ছিল বসুর যুদ্ধ। অথচ, তোমরাই ভেবে দেখ, কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি এমন কাজ করবে? আরব দেশটি তখন ছিল মারামারি কাটাকাটির রাজ্য। আইন শৃংখলার কোন বালাই ছিল না। মানুষের প্রাণের কোন দাম ছিল না।

এমনকি সে দেশের লোকেরা জলজ্যন্ত মানুষকে পয়সার বিনিময়ে দাস বানিয়ে বিক্রি করে দিত। এসব দাসেরা মানুষ হয়েও পশুর মত জীবন যাপন করতো। দিনরাত এদের শুধুই খাটিয়ে নিত তারা। যখন খুশী তখন তাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতো। অথচ তারা কিছু করতেও পারতনা বা এ থেকে মুক্তিও পেতো না। তারা মার খেয়ে শুধুই কাঁদতো এবং সবকিছু নীরবে সহ্য করতে বাধ্য হতো। সেদেশের মানুষ এতই মূর্খ ছিল যে, তারা নিজ হাতে মুর্তি বানিয়ে সেই মুর্তিকেই আবার খোদা মনে করে পুজো করতো।

এমন অন্ধকার আর মূর্খতার দেশেই আল্লাহ্ পাঠালেন সবচেয়ে জ্ঞানী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে। তিনি শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষই ছিলেন না– পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নবীও ছিলেন। নাম তাঁর হযরত মুহাম্মদ (সা.)। জন্মের ছয় মাস আগেই তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। আর মায়ের নাম ছিল আমিনা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের ছয় বছর পর তাঁর মাও ইন্তেকাল করেন। একটু চিন্তা করে দেখতো এমনই একটি শিশুর কথা যার বাবা মা কেউ নেই। এমনই এতিম ছিলেন– আমাদের নবী (সা.)– এই দুনিয়ার সেরা মানুষ। তিনি কোন স্কুল কলেজে পড়েন নি। এমনকি কোন মানুষ তাকে লিখতে বা পড়তেও শেখায় নি। কিন্তু তিনি যে কাজ করেছিলেন, মানুষকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে জ্ঞান আল্লাহ্র কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, তার কোন তুলনাই মানব জাতির ইতিহাসে নেই। তিনি আরবের অসভ্য মানুষদের সুসভ্য মানুষেই শুধু নয় বরং সবচেয়ে সভ্য মানুষে পরিণত করেছিলেন। তাঁর যাদুস্পর্শে আরবের সবচেয়ে খারাপ মানুষরাই হয়ে উঠল সবচেয়ে ভাল মানুষ। চুরি, ডাকাতি, মারামারি দূর হয়ে এক সুন্দর শান্তির সমাজ কায়েম হয়েছিল। এটি দেখে সারা দুনিয়ার মানুষ অবাক হয়ে ভেবেছিল–'এটি হলো কি করে?' তুমিও হয়ত ভাববে– এটি হলো কি করে? সবাই ভাববে– তাইতো! এটি হলো কি করে? হ্যাঁ, এটি হয়েছিল এজন্যেই যে, সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন। খোদার দয়া ও তাঁর প্রচেষ্টায় এই অসাধ্য সাধন হয়েছিল। তাইতো তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ– সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

তিনি জীবনে বড় দুঃখ সয়েছিলেন। ছোট বেলায় তাঁর বাবা মাকে হারিয়েছিলেন। ছেলে বেলায় মাঠে মেষ চড়াতেন। আর ভাবতেন এই

সুন্দর পৃথিবীর কথা– এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন– তাঁর কথা। যতই দিন যেতে লাগল সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ততই বাড়তে লাগল। বড় হয়ে নির্জনে হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে একাকী ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন।

কৈশোরে উকাজের মেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ফুজ্জারের আত্মঘাতী যুদ্ধে বহু মানুষের প্রাণহানী দেখে তাঁর কোমল প্রাণ কেঁদে উঠল। তখন একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই শান্তি সংঘটির নাম ছিল 'হিলফুল ফুজুল'। অন্ধকার যুগে একজন কিশোর এগিয়ে এসেছিলেন অত্যাচারিতদের পাশে– দুনিয়াতে শান্তি আনতে। সমস্ত দুনিয়ার ইতিহাসে এটি ছিল একটি বিরল ঘটনা। এই শান্তি সংঘের ('হিলফুল ফুজুল') সদস্যরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলেন যে:–

(১) আমরা অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করব।

(২) আমরা অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেব।

(৩) আমরা অত্যাচারিতকে সাহায্য করব।

(৪) আমরা দেশের মধ্যে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখব।

(৫) আমরা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব।

যুদ্ধে মত্ত মানুষকে শান্তির পথে আনতে এর চেয়ে ভাল উপায় আর কিছু আছে কি?

তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় আমানত রক্ষাকারী। তাঁর কাছে কেউ কোন আমানত রাখলে তিনি তা সযত্নে রক্ষা করতেন। আবার আমানতদাতা চাইলেই তা ফেরত দিয়ে দিতেন। কখনো মিথ্যা বলাটা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। তাই সবাই তাঁর কথা বিশ্বাস করতো। এজন্যেই তাঁর নাম দিয়েছিল 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী। অথচ মহান আল্লাহ্‌ যখন তাঁকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্যে– সব অবিচার অত্যাচারের শেকল ছিঁড়ে ফেলার জন্যে– সবাইকে সত্যের পথে ডাকতে বললেন; তখন তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা আমার কথা শোন– আল্লাহ্‌ আমাকে পাঠিয়েছেন– অমনি সবাই তাঁর ওপর মহা অত্যাচার শুরু করে দিল। তাঁর কথাতো মানলোই না বরং কত কষ্টই যে দিল তাঁর কোন ইয়ত্তাই নেই। তিনি যে পথে হেঁটে যেতেন তারা সেপথে কাঁটা বিছিয়ে দিত। তিনি নামায পড়তে শুরু করলে এরা তাঁর মাথায় পশুর নাড়িভূঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে আমোদ

করত। শুধু তাঁকেই নয় বরং তাঁকে যাঁরা মেনেছিলেন তাঁদের ওপরও অত্যাচার চালাতো সমানে।

একবার তিনি তায়েফ নামের একটি শহরে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে সমস্ত শহরের মানুষ এমনভাবে পাথর দিয়ে মারল যে তাঁর সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। শরীরের রক্ত বেয়ে জুতায় এসে জমা হলো। রক্ত জমাট বেঁধে এমন অবস্থা হলো যে, তিনি জুতা থেকে পা'ই বের করতে পারছিলেন না। তাদের অত্যাচার এতই মারাত্মক ছিল যে, তাঁকে তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে আগুনের মত গনগনে গরম মরুভূমির আড়াই শতাধিক মাইল পথ পেরিয়ে মদীনাতে চলে যেতে হয়েছিল। আরবের লোকেরা এতই অত্যাচারী ছিল যে, তারা যখন মহানবী (সা.)-এর চলে যাবার খবর পেল তখন তাঁকে হত্যার জন্যেও ধাওয়া করেছিল। মদীনাতেও তারা তাঁকে (সা.) নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়নি। সেখানেও তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তারা যুদ্ধ বাধিয়েছিল। কিন্তু খোদা যার সাথে থাকেন সমস্ত দুনিয়া একত্রিত হয়েও তার কোন ক্ষতিই করতে পারে না। কারণ খোদার শক্তি সবার চেয়েই অনেক বেশি।

আরবদের মধ্যে এমন খারাপ মানুষও ছিল যারা যুদ্ধের মাঠে মৃত মানুষের কলজে চিবিয়ে খেয়েছিল। উহুদের যুদ্ধের ময়দানের একজন শহীদ– মহানবী (সা.)-এর আপন চাচা হযরত হামজা (রা.)-এর বুক চিড়ে তাঁর কলজে চিবিয়ে খেয়েছিল হেন্দা নামের এক মহিলা। দেখ! এরা কত অত্যাচারীই না ছিল। যিনি সারা দুনিয়াকে মুক্তি দিতে, ভালবাসা দিতে এলেন– যিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোতে আনতে এলেন; যিনি ঘোষণা করলেন– দুনিয়ার সব মানুষ সমান– নারী-পুরুষে, সাদা কালোতে কোনই ভেদাভেদ নেই– যিনি শিশুদের ফুলের সাথে তুলনা করতেন– যাঁর মনে ছিল সবার জন্যে ভালবাসা– তাঁকে নির্বোধ মানুষেরা কি কষ্টই না দিল। এতবড় দরদী মানুষটিকে তারা কি ব্যাথাই না দিয়েছিল। একটি বারও ভাবেনি ইনিই তো আমাদের মুক্তিদাতা। অথচ তিনি (সা.) এই কষ্টের প্রতিদানে কি করেছেন? তিনি প্রতিদানে তাদের একটি মাত্র জিনিসই দিয়েছেন। সেটি হলো– ভালোবাসা। তিনি মক্কাতে দশ হাজার মুসলমানসহ বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে এইসব নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের এমনকি– ওই হেন্দাকেও [যে মহানবীর (সা.)-এর চাচা

হযরত হামজা (রা.)-এর কলজে চিবিয়ে খেয়েছিল] ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আজকের দিনে তোমাদের কোন রকম তিরস্কার করা হবে না; দেখ! কত বড় মানুষ ছিলেন আমাদের নবী (সা.)। এজন্যেই তিনি আমাদের আদর্শ। আমরা জীবনের সব কাজের জন্যে চেয়ে থাকি তাঁর কর্মের দিকে।

তিনি হিংসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনো অত্যাচারীর পক্ষে ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যাচারিতদের পক্ষে। তাই আমরাও কাউকে হিংসা করবো না। সবাইকে ভালোবাসবো। কারো ওপর অত্যাচার করবো না। কারো মনে কষ্ট দেবো না। কারো মনে কষ্ট দিলে আমাদের মহানবী (সা.) দুঃখ পেতেন। এ দুনিয়ার– শ্রেষ্ঠ মানুষ এ মহান দরদী নবী (সা.) দুঃখ পেতেন এমন কাজ করলে আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট হবেন। কারণ আল্লাহ্ এই শ্রেষ্ঠ মানুষ– শ্রেষ্ঠ নবীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই তাঁকে কি আমরা কষ্ট দিতে পারি?

খোদার পাহ্লওয়ান

তোমাদের এখন শোনাব তাঁর কথা যিনি মানুষকে মহানবী (সা.) নির্দেশিত সৎপথে চলতে শেখানোর জন্যে আমাদের এই দুনিয়াতে এসেছিলেন। দুনিয়ার মানুষরা যখন পথ হারিয়ে ফেলল, এমনকি মুসলমানরাও যখন মহানবীর (সা.) শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে জঘন্য সব খারাপ কাজ করতে লাগল, তখন দুনিয়ার মানুষকে আবারো পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে একজনকে পাঠালেন। যেহেতু মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে মানুষ ভুলে গিয়েছিল, তাই আল্লাহ্ তাঁকে

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মহানবীর (সা.) গুণ দিয়ে পাঠালেন। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল। একজন মানুষের পক্ষে মহানবী (সা.)-কে যতটা বেশি অনুকরণ করা সম্ভব তাঁর সবটাই তিনি করেছিলেন। তাইতো তিনি বলেছিলেন, 'এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি।' হ্যাঁ, তিনি ছিলেন এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিলে যেমন শত্রু সেনাদের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর শিক্ষাকে মেনে চললেও সব পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আদর্শ মানুষ হওয়া যাবে। মহানবী (সা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল– তাঁর শিক্ষা কি ছিল তা আবারো এ যুগের মানুষকে দেখানোর জন্যেই খোদা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। তোমরা কি জান, তিনি কে ছিলেন– কি ছিল তাঁর নাম? তিনি ছিলেন হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)– নাম ছিল তাঁর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ। তাঁর বাবার নাম ছিল মির্যা গোলাম মোর্তুজা– মায়ের নাম ছিল চেরাগ বিবি। তিনি আজ থেকে প্রায় একশ' আশি বছর আগে ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ফজরের সময় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান গ্রামে জন্মেছিলেন। প্রতিদিনই পৃথিবীতে এমন অনেক শিশু জন্ম নেয়। কিন্তু কে জানত এই শিশুটিই বড় হয়ে একদিন সমস্ত দুনিয়াকে নাড়া দেবে? কে জানত যে, এই ছেলেটিকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন মানুষের সংশোধনের জন্যে– মানুষকে মহানবী (সা.)-এর পথে চলতে শেখানোর জন্যে– তাদেরকে পাপ থেকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্যে। সবাই না বুঝলেও সত্যিকার জ্ঞানীরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, এই ছেলে কোন সাধারণ ছেলে নয়– এ এক অসাধারণ ছেলে। ছেলেবেলায় তিনি সাথীকে বলতেন, 'দোয়া করো যেন, খোদা আমাকে নামায পড়ার সৌভাগ্য দেন'। কারো সাথেই ঝগড়া ফাসাদ করতেন না। জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। কারো মনেই কষ্ট দিতেন না। কাউকে গালি দিতেন না। এমনকি কাউকে 'তুই' পর্যন্ত বলতেন না। খুবই শান্ত ছিল তার স্বভাব। যেই তাঁকে দেখতো সেই ভাবতো, 'ছেলেটি এতই ভাল'। ছেলেবেলায় তিনি কিল্লা মিয়া সিংহের মৌলভী গোলাম রসুল সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে আলাপ আলোচনা চলছিল। এর মধ্যেই মৌলভী গোলাম রসুল সাহেব বললেন– 'এ জামানায় কোন নবী হওয়ার থাকলে এই ছেলে নবুওতের যোগ্য'। ছেলেবেলাই তাঁর চরিত্রের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চেয়ে ২০ বছরের বড় কাদিয়ানের নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দা এক হিন্দু ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, হযরত

ইমাম মাহ্দীর (আ.)-এর বাবা আফসোস করে বলতেন– 'আমার এই ছেলে মুসিতর (অধিকাংশ সময় মসজিদে নামায এবং কুরআন শরীফ পাঠে অতিবাহিত করে), সে চাকুরীও করে না, কোন উপার্জনও করে না।' এ ঘটনাটি বলার পর সেই হিন্দু ভদ্রলোক বলতেন, 'আজ তিনি [ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর বাবা] বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন যে, ইনি কেমন শাহানশাহ হিসেবে ঘরে সমাসীন এবং কতশত লোক দূরদুরান্ত থেকে তাঁর দরজায় গোলামীর জন্যে আসে'। সেই অখ্যাত গ্রামের শান্ত ছেলেটিই বড় হয়ে ইসলামকে রক্ষার জন্যে দাঁড়ালেন। তখন ইসলামের দুশমনরা ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদের অপপ্রচারে দলেদলে মুসলমান খ্রিষ্টান হতে লাগল। ভারতবর্ষের তের লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে গেল। আগ্রা জামে মসজিদের খতিব ইমাদুদ্দীন খ্রিষ্টান হয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে খারাপ ভাষায় ভীষণ গালিগালাজ করতে লাগল। সিরাজ উদ্দীন, আব্দুল্লাহ্ আথম প্রভৃতি মুসলমান আলেমরা খ্রিষ্টান হয়ে ইসলামের মহা দুশমনে পরিণত হল। খ্রিষ্টানরা পবিত্র কাবা ঘরে খ্রিষ্টধর্মের পতাকা ওড়ানোর স্বপ্ন দেখতে লাগল। পন্ডিত লেখরাম, দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রভৃতি হিন্দুধর্মের নেতারাও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

এর ফলে মৌলভী নুরুল্লাহ্সহ বহু মুসলমান দলে দলে হিন্দু হয়ে ইসলামের প্রতি উপহাস করতে লাগল। আমেরিকার জিয়ন সিটির আলেকজান্ডার ডুই নামের এক ব্যক্তি নিজেকে এলিয়া নবী দাবী করে ইসলামকে উপহাস করতে লাগল। সারা দুনিয়াতে ইসলামকে ধ্বংসের জন্যে সবাই একসাথে হামলা চালাতে শুরু করল। ইসলামের এই দুর্দিনে ধর্মকে রক্ষার বদলে মুসলমানরা নিজেদের মাঝে ঝগড়া ফাসাদ নিয়েই মশগুল থাকল। তারা ভেবেও দেখল না ইসলামের কত বড় বিপদ। ইসলামের দুশমনে চারদিক ছেয়ে গেল। ইসলাম হয়ে গেল এক অসহায় ব্যক্তির মত যার চারদিকেই দুশমন। দুশমনরা সবাই ভেবেছিল এবার ইসলাম অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের রক্ষাকর্তা হলেন মহান আল্লাহ্। তিনি এই মহা দুর্দিনে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে এক বীর পুরুষকে দুনিয়াতে পাঠালেন। বলতো তিনি কে ছিলেন? তিনিই ছিলেন খোদার পাহ্লওয়ান ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। মহান আল্লাহ্ই তাঁকে এ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তিনি

ইসলামের দুশমনদের যুক্তিতর্কে, লেখনী– বক্তৃতায় এমনভাবে পরাজিত করলেন যে, তারা আর কেউই মাথা তুলতে সাহস পেলনা। তাই বলে তারা চুপ করে বসেও রইল না। তারা সবাই মিলে তাঁকে কষ্ট দিতে লাগল। তাঁকে খুবই খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল। এমনকি তাঁর ওপর আক্রমণের চেষ্টাও হলো। তারা ষড়যন্ত্র করে ১৮৯৭ সালে একটি মিথ্যা খুনের মামলা সাজিয়ে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাতেও চাইল। তিনি কিন্তু এতে বিচলিত হলেন না। তিনি এদেরকে পাল্টা গালিও দিলেন না। বরং তিনি এদের জন্যেই আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে লাগলেন। তিনি এসেছিলেন সবার কল্যাণ করতে। অথচ সবাই মিলে তাঁর অকল্যাণের কি চেষ্টাই না চালিয়েছিল। কিন্তু পরিনামে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তাদের সাজানো মামলার সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। এ মামলার জন্যে সাজানো মিথ্যা সাক্ষী আব্দুল হামিদ নিজের দোষ স্বীকার করে আহমদী হয়ে গেল। সত্যের হলো জয়।

দেখ! আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে বিপদমুক্ত করতে তিনি কতই না চেষ্টা করেছেন; অথচ, মুসলমানদের মধ্যেও কিছু নির্বোধ মানুষ তাঁকে কি কষ্টই না দিয়েছিল।

একবার হযরত ইমাম মাহদী (আ.) অমৃতসর শহরে খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহাসা (খোলাখুলি বিতর্ক) করতে গেলেন। তখন একশ্রেণীর মৌলভী সাহেবরা তাঁকে ভীষণ গালিগালাজ করতে লাগল। কেউ কেউ তাঁকে তাদের সাথে বাহাস করতেও বললেন। এর উত্তরে তিনি মৌলভী সাহেবদের সাথেও বাহাস করার কথা ঘেষেণা করলেন। মৌলভী সাহেবরাও তাতে রাজী হলেন এবং বাহাসের সময়ও ঠিক হলো। একথা জেনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী অন্যদের ভয় দেখালেন যে, তারা কেউই মির্যা সাহেবের [অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর] সাথে টিকতে পারবেন না তাই যে কোন ছুতোয় বাহাস এড়িয়ে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল। নির্দিষ্ট দিনে অমৃতসরের সব বড় বড় মৌলভী ঐ শহরের মোহাম্মদ জানের মসজিদের নীচের একটি কামরায় বসে বাইরে থেকে তালা দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারা মুয়ায্‌যীনকে শিখিয়ে দিলেন যেন কেউ তাদের খোঁজ নিলে বলেন যে, মৌলভী সাহেবরা দাওয়াতে গেছেন। তালা দেয়ার পর চাবিটি রাখা হলো ঐ মুয়ায্‌যিনের কাছে। বাহাসের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে মৌলভী সাহেবদের পাওয়া না যাওয়াতে অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খাজা

মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব মৌলভী সাহেবদের খোঁজে ঐ মসজিদে গেলেন এবং মুয়ায্যিন সাহেবকে মৌলভী সাহেবদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে মুয়ায্যিন বললেন যে, তারা সেখানে নেই দাওয়াতে গেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন কার বাড়ীতে? মুয়ায্যিন জবাব দিলেন যে তিনি জানেন না। তখন তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলতেই দেখা গেল সব মৌলভী সাহেবই ঐ ঘরে বসে আছেন। তখন মৌলভী সাহেবদের চেহারার রং পাল্টে গেল। তারা মহা অস্বস্তিতে পড়লেন। অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি তাদেরকে বললেন, "আজ বাহাসের দিন। আপনারা এখানে লুকিয়ে আছেন। কাল মির্যা সাহেব চলে যাবেন। তখন বাহাস কার সাথে হবে?" এদিকে বাহাসের সময় উত্তীর্ণ হবার পরে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর কাদিয়ানে ফিরে যাবার সময় হয়ে এল। তিনি স্টেশনে পৌঁছার আগেই দেয়ালে দেয়ালে ইশতেহার সাঁটা হলো। তাতে লেখা ছিল, "মির্যা পলায়ন করেছে।" এসব লোকজন তাঁর গাড়ীর পিছে পিছে দৌড়াতে লাগল। তারা চিৎকার করে গালি দিতে লাগল আর আগে থেকে ছাপানো বিজ্ঞাপন বিলি করতে লাগল।

যুগে যুগে খোদার প্রেরিত পুরুষদের এমনভাবেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এতে দমে যান নি। কারণ তাঁরা থাকেন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর মিথ্যা কখনো সত্যের ওপর জয়যুক্ত হতে পারে না। আমরাও তাই সবসময় সত্য পথে চলবো। কাউকে গালি দেবো না। কারো মনে কষ্ট দেবো না। দুনিয়ার সব মানুষের কল্যাণ করতে চেষ্টা করব। আর ইসলামের বিজয়ের জন্যে দিনরাত চেষ্টা করব যাতে সারা দুনিয়ার মানুষ শান্তির পথে আসতে পারে।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এবং তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবাগণের ছবি

মাহমুদ নামের ছেলেটি

মুসলেহ মাওউদ
হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

আজ থেকে ১২৭ বছর আগে ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারিতে ভারতের কাদিয়ানে জন্ম হয়েছিল একটি ছেলের। মাহমুদ নামের এই ছেলেটির পুরো নাম ছিল মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। তাঁর জন্মের আগেই মহান আল্লাহ্ তাঁর বাবাকে জানালেন যে, এই শিশুটি বড় হয়ে হবে এক অসাধারণ কর্মবীর।

এই শিশুটির বাবা ছিলেন ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গেলাম আহমদ (আ.)। আল্লাহ্ তাঁকে জানালেন যে, এই ছেলে হবে তাঁর সত্যতার নিদর্শন। তিনি হবেন একজন মেধাবী, প্রতাপশালী ও পবিত্র পুত্র। তিনি পৃথিবীর কোনায় কোনায় খ্যাতিলাভ করবেন। ১৮৮৬ সালের ২০শে ফ্রেব্রুয়ারিতে এই ভবিষ্যদ্বানীর কথা তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন। এমনিতে কেউই বলতে পারে না যে, তাকে আল্লাহ্ কোন সন্তান দেবেন কিনা। তার ওপর সে সন্তানটি কেমন হবে তাতো খোদার ইঙ্গিত ছাড়া কেউ বলতেই পারে না। এ প্রতিশ্রুত পুত্রের জীবনে এসব ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে একথাই প্রমাণ করেছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছিলেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) যে বছর বয়াত গ্রহণ শুরু করেন সে বছরই এই সন্তানের জন্ম হয়। কিশোর বয়সেই তিনি 'তাশহিযুল আযহান' (বুদ্ধির প্রখরতা বুদ্ধি) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। এ বয়সে পত্রিকা 'সম্পাদনা' চাট্টিখানি কথা নয়। সবাই এটি দেখে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা বলতে লাগল। শুধু তাই নয় ১৯১৩ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি 'আলফজল' (আশীষ) পত্রিকাটি বের করেন, যা আজ অব্দি আহমদীযা মসলিম জামা'তের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর দুনিয়ার সব বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্র প্রেরিত এই মহাপুরুষকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগল। তারা বলতে

লাগলো যে, এবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আর অস্তিত্ব থাকবে না। তখন এই মহান সন্তান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি কখনো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ থেকে দুরে সরে যাবেন না। তিনি জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন।

১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে ২৫ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হলে কেউ কেউ ভেবেছিল যে এতটুকু ছেলে খলীফা হয়ে গেল! কিন্তু তাঁকে দাঁড় করিয়েছিলেন মহান আল্লাহ্। তিনি তাঁকে এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে অসাধারণ জ্ঞানও দিয়েছিলেন। শত বিপদ ও বিশৃংখলার মুখেও তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্যে বলীয়ান হয়ে সাফল্যের সাথে জামা'তকে পরিচালনা করেন। তোমাদের মত ছোট ছেলেদের জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মজলিস আতফালুল আহমদীয়া। তোমাদের মত ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে তিনি গঠন করেছিলেন নাসেরাতুল আহমদীয়া। যুবকদের জন্যে গঠন করেছিলেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া। মহিলাদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও বয়স্ক (চল্লিশোর্ধ) পুরুষদের জন্যে গড়েছিলেন মজলিস আনসারুল্লাহ্।

অসাধারণ কর্মবীর ছিলেন এই মহাপুরুষ। তিনি সারা দুনিয়ার কোনায় কোনায় ইসলামের বার্তা প্রচার করার জন্যে জীবন উৎসর্গকারী ইসলাম প্রচারক দল পাঠালেন। ফলে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশে দেশে বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য মানুষ সব ভুল বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামকে গ্রহণ করেন।

একবার ভারতের উগ্রপন্থী হিন্দুরা মুসলমানদের জোর করে হিন্দু বানাতে লাগল। আর্যসমাজী নামে পরিচিত এই উগ্রপন্থী হিন্দুরা তাদের এই কার্যকলাপের নাম দিয়েছিল 'শুদ্ধি আন্দোলন'। শুনলে অবাক হবে যে, এর ফলে চল্লিশ হাজারেরও বেশি মুসলমান হিন্দু হয়ে গেল। অনেক মৌলভী সাহেবও হিন্দুর খাতায় নাম লিখিয়ে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিল। অথচ অন্যান্য মুসলমানরা তাদেরকে এথেকে উদ্ধারের বদলে শুধুই আফসোস করে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থেকেই তাদের কর্তব্য শেষ করল। মুসলমানদের বিপদের এই দিনে ইসলামের এই বীর কিন্তু অন্যদের মত চুপটি করে বসে রইলেন না। কেউ

এগিয়ে না এলেও তিনি তাঁর জামা'তকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি ১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেন। নেতার ডাক শোনামাত্রই আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গীকৃত এই জামা'তের সদস্যরা যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন ছুটে চললেন জেহাদের ময়দানে। এটি কিন্তু তলোয়ারের যুদ্ধ ছিল না। এটি ছিল যুক্তি ও শিক্ষার যুদ্ধ। দলে দলে শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, কৃষক প্রভৃতি সর্বস্তরের আহমদী গিয়ে এই মহান জেহাদে অংশ নেন। তাঁরা এই মহান খলীফার নেতৃত্বে নিজেদের আদর্শ ও প্রচার দিয়ে এসব মুসলমানকে আবারো ইসলামে ফিরিয়ে আনলেন। মুসলমানদের বিপদকালের একমাত্র পরীক্ষীত বন্ধু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই এই জেহাদে অংশ নিয়েছিল। এ ময়দানেও জয় হলো ইসলামের। ফলে ছয় মাসের মধ্যেই সেই উগ্র হিন্দুরা রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল যে, তারা এই আন্দোলন ত্যাগ করছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য পুষ্ঠ হয়ে এই মহাপুরুষ সেদিন ঘোষণা করেছিলেন যে, শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে যদি একজন মুসলমানও হিন্দু অবস্থায় থেকে যায় তবে তার জন্যেও অভিযান চালানো হবে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে উপমহাদেশ জুড়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলো। ভাইয়ে ভাইয়ে খুনাখুনি শুরু হলো। একজন মানুষ অন্য মানুষকে খুন করতে লাগল। কার ধর্ম কি তা নিয়েই তারা মেতে রইল। সবাই যে মানুষ এই সত্যি কথাটা একদম ভুলে রইল। সে এক ভয়ংকর সময়। অমৃতসরসহ সমগ্র পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদেরকে নির্দয়ভাবে খুন করা হতে লাগল। নিষ্পাপ শিশুরাও রেহাই পেল না এই নির্বিচার হত্যাকান্ড থেকে। অন্যরা যখন নিজেদের জান বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন এই মাহান খলীফা তাঁর জামা'তকে নিয়োজিত করেছিলেন দুর্দশাগ্রস্থ ও বিপন্ন মানুষকে বাঁচাতে। দেখ! কত বড় মানব দরদী ছিলেন তিনি। গোটা দুনিয়ার মানুষকে দারিদ্র ও দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যেও এই মানবদরদী মহাপুরুষ অনেক বড় বড় কাজ করে গিয়েছেন।

১৯৪৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে ঘোষণা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী তিনিই হলেন সেই মুসলেহ্ মাওউদ। এটি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হবার দিন। আমরা তাই আল্লাহ্‌র কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানানোর মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে প্রতিবছর স্মরণ করি।

তিনি ছিলেন অসাধারণ বক্তা। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯০৬ সালে তিনি সালানা জলসায় বক্তৃতা দেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে গিয়ে ইসলামের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। বড় হয়ে তোমরা যখন তাঁর লেখা মহামূল্যবান বই গুলো এবং পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা পড়বে তখন তোমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে যে, কাদিয়ানের সেই ছেলেটি সত্যিই ছিল এক প্রতিশ্রুত সন্তান।

মুসলেহ মাওউদ হবার দাবি করার পরে ভারতের হোশিয়ারপুরে নামাযরত অবস্থায় হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা সত্যিকার ইসলামের এই অগ্রযাত্রায় অনেকেরই হিংসে হলো। তারা ষড়যন্ত্র আঁটলো ইসলামের এই মহান বীরকে হত্যা করার। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ তারিখে আসরের নামায পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আব্দুল হামিদ নামের এক ব্যক্তি তাঁকে হত্যার জন্যে তাঁর ঘাড়ে ধারাল ছুরি বসিয়ে দেয়। তিনি গুরুতরভাবে আঘাত পান। আঘাতকারী হাতে নাতে ধরা পড়লেও তিনি তাকে মাফ করে দেন। আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিরা হন এমনই উদার। আর পথভ্রষ্ট মানুষরাই যুগে যুগে তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ইসলামের জয়যাত্রায় নেতৃত্ব দেয়ার পর ১৯৬৫ সালের ৮ই নভেম্বর এই মহাপুরুষ ইন্তেকাল করেন।

তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, যতই আমরা মন্ত্রী হই বা সেনানায়ক হই, তিনি কিছুতেই তাতে খুশী হবেন না, যদি আমরা মুসলমান না হই। অর্থাৎ পৃথিবীতে উন্নতি করতে হবে ঠিকই কিন্তু কিছুতেই ইসলামকে ছাড়লে চলবে না। ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। কারণ ইসলামেই রয়েছে আমাদের মুক্তি। এস আমরা সবাই সারা জীবন একথা মনে রাখি।

খোদার দয়া

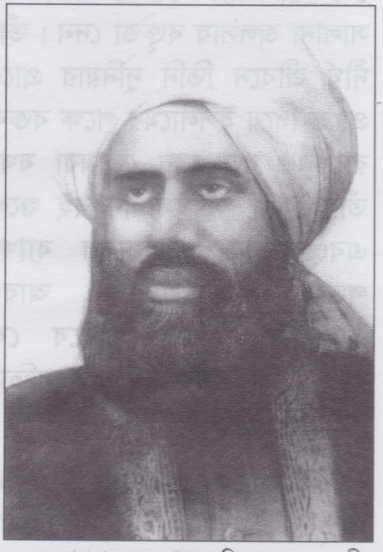

হযরত আলহাজ্ব মাওলানা হেকিম হাফেয নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)

আজ থেকে একশ'পয়ষট্টি বছর আগে ১৮৪১ সালে পাঞ্জাবের শাহপুর জেলার ভেরা নামক স্থানে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবার নাম ছিল হাফেয গোলাম রসুল ও মায়ের নাম ছিল নূর বখ্ত। সাত ভাই ও দু' বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তাঁর বাবাসহ দশজন পূর্বপুরুষের পবিত্র কুরআন মুখস্থ ছিল। তিনিও ছিলেন পবিত্র কুরআনে হাফেয।

তাঁর নাম ছিল হযরত আলহাজ্ব মাওলানা হেকিম হাফেয নূরুদ্দীন (রা.)। তিনি ছিলেন হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) তাঁকে এতই ভালবাসতেন যে, তিনি বলতেন, যদি জামা'তের সবাই নূরুদ্দীন হয়ে যেত তবে কতই না ভাল হত!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল করীম (রা.)-এর ইন্তেকালের কিছুদিন পর হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে যেতে লাগলেন। একদিন তিনি (আ.) হযরত নূরুদ্দীন (রা.)-এর জন্যে নিজেই ঔষধ তৈরী করতে লাগলেন। তাঁর উদ্বেগ লক্ষ্য করে হযরত উম্মুল মুমেনীন [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্ত্রী] তাঁকে বললেন, 'মৌলভী বুরহানউদ্দীন চলে গেলেন, মৌলভী আব্দুল করীম ইন্তেকাল করেছেন, মহান আল্লাহ্ মৌলভী সাহেবকে (হযরত নূরুদ্দীনকে) দ্রুত সুস্থ করে তুলুন।' একথা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, 'ইনি একাই হাজারো আব্দুল করীমের সমান।' দেখ! হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) তাঁকে কত ভালবাসতেন। তিনি বলেছিলেন, 'মৌলভী নূরুদ্দীন শোনা মাত্র আমার

ওপর ঈমান এনেছেন। তিনি হযরত উমরের (রা.) বংশধর, তিনি হযরত আবু বকরের (রা.) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন।'

হযরত নূরুদ্দীন (রা.)-এর ছিল জ্ঞান অর্জনের অসীম তৃষ্ণা। জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা ছিল ভীষণ প্ররিশ্রমের কাজ। কিন্তু তিনি পরিশ্রমকে অগ্রাহ্য করে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে, এমনকি সুদুর আরবেও গিয়েছিলেন জ্ঞানের অন্বেষণে।

সাইয়েদ হুসেইন, শেখ মুহাম্মদ খাজরাজী, শেখ আব্দুল গণি মুজাদ্দেদী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি জ্ঞানের অন্বেষণ করেন। অবশেষে তিনি এই যুগের আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সন্ধান পেলেন এবং তাঁর কাছে গিয়ে শুধুমাত্র এই প্রশ্ন করলেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) হবার দাবী করেছেন কিনা। তাঁর জবাব শোনামাত্রই তিনি তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন। অথচ কাদিয়ানের একবারে নিকটবর্তী বাটালা নিবাসী মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন আল্লাহ্র দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় যুগ ইমামকে চিনতে পারেন নি বরং বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি ঐশীজ্ঞানও পাননি। আসলে সত্য পথ পাওয়া এবং সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উপায় হলো খোদার দয়া। তিনি দয়া করলেই আমরা তা লাভ করতে পারি। খোদার দয়া লাভ করলে মানুষের অন্তর কিভাবে দ্রুত বদলে যেতে পারে নীচের ঘটনাটি পড়লেই তা বুঝতে পারবে।

হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) শুধু একজন মহাজ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি একজন নামকরা চিকিৎসকও ছিলেন। দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে আসতেন। মার্দান (বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি শহর) থেকে এমনই একজন তাঁর কাছে এলেন চিকিৎসার জন্যে। তিনি দীর্ঘ দিন থেকেই রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু রোগ কিছুতেই সারছিল না। তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ঘোরতর বিরোধী হবার কারণে সহজে কাদিয়ানেও আসতে চাইছিলেন না। কিন্তু রোগের চিকিৎসার জন্যে যখন তিনি কাদিয়ানে এলেন, তখন

আহমদীরা যে এলাকাতে বাস করতেন সে এলাকাতেই তিনি থাকলেন না। অন্য এলাকায় উঠলেন। তাঁর চিকিৎসাও এগিয়ে চললো। তিনি ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কাদিয়ানে থাকাকালীন সময়ে তাঁর সাথে একজন আহমদীর বেশ সখ্যতা হয়। তিনি তাকে আহমদীদের মসজিদে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা- মির্যা সাহেবের সাথে তিনি দেখাটি পর্যন্ত করবেন না। অবশেষে তিনি এই শর্তে রাজী হলেন যে, যখন হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) মসজিদে থাকবেন না কেবলমাত্র তখনই তিনি আহমদীদের মসজিদে যাবেন। এই অনুযায়ী এমন এক সময় তাঁকে নিয়ে সেই আহমদী বন্ধু মসজিদে প্রবেশ করলেন যখন কোন নামাযের সময় ছিল না এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বা অন্য কোন ব্যক্তিই ঐ মসজিদে ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম। তিনি ঢুকবার পরপরই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) কোন বিশেষ কাজের জন্যে সেই মসজিদে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথেই ঐ ব্যক্তি তাঁকে দেখেন ও দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর ভেতর এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন সূচিত হয়, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সেই আশ্চর্য্য রকমের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে তিনি অভিভুত হয়ে পড়েন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে তখনই বয়াত গ্রহণ করেন এবং আহমদীয়াতের আলোতে নিজেকে উজ্জ্বল করে মহা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হন। দেখ! খোদার দয়া লাভ করে মানুষের অন্তর কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবেই খোদার দয়া লাভ করলে ঘোরতর শত্রুও মিত্রে পরিণত হতে পারে। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-কে হত্যা করতে এসে হত্যার বদলে নিজেই তাঁর দাসত্বের শেকল পরে নিয়ে ইসলাম কবুল করলেন। অথচ রসূল (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবু জাহল খোদার দয়া থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাঁকে গুহণ করতে পারে নি। কাজেই আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, খোদার দয়া ছাড়া আমরা কখনোই সৌভাগ্যবান বা সফল হতে পারি না।

অমুসলিমদের মুসলমান করার ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাফল্যে সন্দেহ করে একবার একজন বিরুদ্ধবাদী লেখালেখি শুরু করল। এটি দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অমুসলমানদের তালিকা তৈরী করার জন্যে হযরত নূরুদ্দীন (রা.)-কে

বললেন। তিনি (রা.) যে তালিকাটি তৈরী করলেন তাতে প্রথমেই লিখলেন তাঁর নিজের নাম। তিনি এটির ব্যাখ্যায় বলেছিলেন যে "আমিতো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকেই সত্যিকার ইসলামকে পেয়েছি।" দেখ! কত গভীর আস্থা ছিল তাঁর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি। একবার একব্যক্তি তাঁর মেয়েকে কোন ছেলের সাথে বিয়ে দিলে ভাল হয় তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে জানতে চাইলেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে পরামর্শ দিলেন তাতে তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তখন হযরত নূরুদ্দিন (রা.) বললেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদি তাঁর (রা.) আদরের মেয়ে আমাতুল হাইকে একজন ঝাড়ুদারনীর ছেলের সাথেও বিয়ে দিতে বলেন তবে তাঁর সে আদেশ মানতে তিনি কোনই দ্বিধা করবেন না। মহান আল্লাহ্ তাঁর এই আন্তরিকতা ও আনুগত্যের মূল্য দিয়েছিলেন। তাঁর (রা.) এই পুণ্যবতী মেয়ে হযরত আমাতুল হাই (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল আর এক মহাপূণ্যবান ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর সাথে। ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী লুধিয়ানা শহরে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বয়াত গ্রহণ শুরু করলে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা)-ই ছিলেন প্রথম বয়াত গ্রহণকারী। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতায় ছিল তাঁর অটল আস্থা। তিনি তাঁর (আ.) সান্নিধ্য পাবার জন্যে ভেরায় অবস্থিত নিজ বাড়ী ছেড়ে কাদিয়ানে এসে একটি সাধারণ বাড়ীতে বসবাস করতে লাগলেন।

তাঁর প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরও ছিল প্রবল আস্থা। ১৯০২ সালের জুন মাসে একজন হিন্দু যুবক কাদিয়ানে এসে ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ্। তিনি (আ.) তাঁকে ইসলাম সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব দেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)-কে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই নওমুসলিম সাহাবী পরে ডা. আব্দুল্লাহ্ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সরদার মেহের সিং নামের এক তরুণ শিখ সত্যিকার ইসলামে দীক্ষিত হলে তাঁর নাম রাখা হলো আব্দুর রহমান। এই সাহাবীকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার দায়িত্বও পালন করেছিলেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দিন (রা.)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে যথার্থই বলতেন যে, তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্যবতী বড় মেয়ে হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবা (রা.)-কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে বিশেষভাবে দোয়া করতে বললেন। তিনি (রা.) পরবর্তী রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি একান্তভাবে দোয়া করছেন এবং ওপরের কক্ষে একটি বই হাতে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) বসে আছেন। তিনি হযরত মুবারাকা বেগম (রা.)-কে বললেন, "এই বইয়ে আমার সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ ইলহামসমূহ রয়েছে। আমি আবু বকর।" অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এটা আগেই নির্ধারিত ছিল যে মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে যেমন হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমানদের একতাবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি এযুগেও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ এমনই একজন আবু বকর (রা.)-কে ধর্ম ও মানবজাতির রক্ষার জন্যে দাঁড় করাবেন। তাই এযুগের আবু বকর (রা.) ছিলেন হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)। ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর ২৭শে মে তারিখে তিনি প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। অত্যন্ত দৃঢ়তা ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্‌রই মনোনীত এই জামা'তকে ছয় বছর নেতৃত্ব দেয়ার পর এই মাহপুরুষ ১৯১৪ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে এই পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নেন। তিনি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন বটে কিন্তু খোদার দয়া লাভ করে মানুষ কি করে ধন্য হতে পারে আমাদের জন্যে তা মহা দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আমরা যদি সব কাজেই খোদার দয়া ও সাহায্য লাভ করতে পারি তবে সব কাজেই আমরা সফল হবো। তাই আমাদের সবার উচিত সব সময় আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করা যাতে আমরা সর্বদাই তাঁর দয়া লাভ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফল হতে পারি। সেই সাথে আমাদের এই দোয়া এবং চেষ্টাও করা উচিত যাতে পৃথিবীর সব মানুষই খোদার দয়া লাভ করে ধন্য হতে পারে।

ক্রীতদাস থেকে নেতা

ইসলামের পূণর্জাগরণের বর্তমান যুগে একজন নিবেদিত প্রাণ আফ্রিকান আহমদী মুসলমান ড. ইব্রাহীম বাংগুরা আযান দিচ্ছেন

প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। সে সময় আরব দেশে চলছিল 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকারের যুগ। সে দেশে বর্বর মানুষদের দাপট চলছে তখন। মানুষের কোন মর্যাদা নেই। পয়সা দিয়ে মানুষ বেচা কেনা করা হত হাটে বাজারে। যেমন বেচা কেনা হয় গরু ছাগল। যাদেরকে দাস বানিয়ে বিক্রী করা হত তাদের মানুষ হিসেবে কোন মর্যাদা ছিল না। পশুর মতই ব্যবহার করা হত তাদের সাথে। পশুর মত দিনরাত খাটাই ছিল তাদের কাজ। মালিকের ইচ্ছা হলেই তাকে বেচে দিত। আরেকজন কিনে তাকে বেঁধে নিয়ে যেত– ঠিক যেন একটি পশু। কেউ একবার দাস হয়ে গেলে মৃত্যু ছাড়া তাকে কেউই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিত না। দাসেরা মরে গেলে এই গ্লানিকর জীবন থেকে এবং একই সাথে এই দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করত। তাদের কষ্টে সমবেদনা জানাবার মতও কেউ ছিল না। এমনই একজন ক্রীতদাসের নাম ছিল বেলাল। তোমরা কি জান কে ছিলেন এই বেলাল? তিনি ছিলেন সেই দুঃখী ছেলেটি যাঁর জীবন কেটেছিল উপেক্ষা আর অবহেলায়। তাঁর বাবা মা দুজনেই ছিলেন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে তাদের দাস হিসেবে আরবে আনা হয়েছিল। তারা কিন্তু জন্মগতভাবে ক্রীতদাস ছিলেন না। তার বাবার নাম ছিল রাবাহ্, মায়ের নাম হামামা। তাঁর ছিল খলিদ নামের একটি ভাই এবং আকারা নামের এক বোন। তার গায়ের রং ছিল ইথিওপিয়ার অন্য সব মানুষের মতই কালো। ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মেছিলেন বলে তিনি ছিলেন জন্মগত দাস।

বেলাল (রা.)-কে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছিল মক্কার এক অত্যাচারী এবং বদমেজাজী ব্যক্তি। লোকটির নাম ছিল উমাইয়া বিন খাফ। সে তাঁর ওপর ভীষণ অত্যাচার করত। হযরত ওমর (রা.) তখন মুসলমান হয়েছেন। একদিন বেলাল (রা.) শুনতে পেলেন যে, লোকজন হযরত ওমর (রা.) কে ক্রোধের সাথে বলছে– 'মুহাম্মদ তোমাদের কি শেখায়?' জবাবে ওমর (রা.) শান্তভাবে বললেন– 'তিনি (সা.) বলেন যে, আল্লাহ্ এক এবং আমাদের উচিত শুধু মাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং আমরা সবাই তাঁরই দাস এবং আমরা সবাই সমান যেমন একটি চিরুনির দাঁতগুলো পরস্পর সমান হয়ে থাকে।' জীবনে এমন কথা বেলাল (রা.) কখনো শোনেন নি। এওকি হতে পারে? সব মানুষ কি সমান হওয়া সম্ভব? দাস আর মুনিব কি কখনো সমান হতে পারে? বেলাল আর উমাইয়া বিন খাফ কি সমান? তিনি ভেবেই পেলেন না কি কথা তিনি শুনলেন? এরপর উমাইয়া বিন খাফ মহা উত্তেজিতভাবে হযরত ওমর (রা.) কে প্রশ্ন করল, 'এই যে বেলাল যাকে আমি পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি– সে কি আমার সমান হবে?' ওমর (রা.) শান্তভাবে জবাব দিলেন– 'মুহাম্মদ (সা.) এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, খোদার দৃষ্টিতে সব মানুষ, সব গোত্রই সমান।' এসব কথা শুনে বেলাল (রা.) ততক্ষণে মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর বিশ্বাস এনে ফেলেছেন। মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে পয়সা দিয়ে না কিনেও তাঁর মনের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে গেলেন। অথচ উমাইয়া তাকে পয়সা দিয়ে কিনলেও তার মনকে ছুতে পারেনি মোটেই। হযরত ওমর (রা.)-কে চাবুক দিয়ে মারার জন্যে উমাইয়া বেলাল (রা.) কে আদেশ দিল। কিন্তু বেলাল (রা.) তাকে মারতে পারলেন না। কারণ তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনিত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এনেছিলেন। তিনি ইমান এনেছিলেন এক আল্লাহ্র প্রতি। উমাইয়ার নির্দেশ অমান্য করার কারণে সে রাতে বেলালকে বেঁধে বন্দী করে রাখল। এই নির্যাতনে বেলালের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। তিনি সারারাত ঐ বন্দী অবস্থাতেই আল্লাহ্র কাছে কাতরভাবে দোয়া করতে লাগলেন। রাত পেরিয়ে সকাল হলো। দিনের আলো ফুটলো। আরব দেশের রোদ তো নয় যেন জ্বলন্ত আগুন। ঐ আগুনের মত গরম পাথুরে পথ দিয়ে বেলাল (রা.)-কে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। যার মনে এতটুকু দয়া মায়া আছে সে ঐ পথ দিয়ে কোন পশুকেও টেনে নিয়ে যাবে না। অথচ একজন মানুষকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো ঐ পথ দিয়ে। তপ্ত

পথে জ্বলন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে তাকে উমাইয়া শুইয়ে দিল। তারপর তার বুকের ওপর একটি ভারী গরম পাথর চাপা দিয়ে তাকে শুধুই চাবুক মারতে লাগল। অত্যাচারে বেলাল জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। একটু চেতনা ফিরে পেতেই তিনি বলে উঠছিলেন, 'আহাদ!' 'আহাদ!' অর্থাৎ আল্লাহ্ এক! আল্লাহ্ এক! উমাইয়া রাগে ফেটে পড়ল। সে বলল, 'বেলাল বল্, লাত্ এবং উজ্জা হলো তোর প্রভু।' প্রচন্ড তৃষ্ণায় তার প্রাণ শুকিয়ে আসছিল। কথা বলার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অনেক কষ্টে বলে উঠছিলেন– 'আহাদ!' 'আহাদ!'– আল্লাহ্ এক! আল্লাহ্ এক!

এদিকে সত্য ধর্ম গ্রহণ করাতে বেলালের (রা.) ওপর এই অবর্ণনীয় অত্যাচার দেখে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে কিনতে চাইলেন। উমাইয়া প্রথমে তাকে বিক্রী করতে না চাইলেও পরে যখন ভাবল যে এই দাসটি মরেই গেছে তখন তাকে বেচতে রাজী হলো। দাম ঠিক হলো একশো দিরহাম (আরব দেশের টাকাকে বলে দিরহাম) এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) বেলাল (রা.)-এর কাছে এসে জোরে জোরে তাকে ডাকতে লাগলেন। বেলাল (রা.) ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলেন। এটি দেখে উমাইয়া ভীষণ রাগে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওরে হাবসী! নিকৃষ্ট জানোয়ার। কালো দাস। তুই এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছিস?' বেলাল (রা.)-কে জীবিত দেখে সে তার দাম আরও একশো দিরহাম বেশি হাঁকলো। অর্থাৎ বেলাল (রা.)-এর দাম তখন একশো থেকে বেড়ে গিয়ে হয়েছে দু'শো দিরহাম।

হযরত আবু বকর (রা) তো এসেছিলেন এই যন্ত্রণার জীবন থেকে বেলাল (রা) কে মুক্তি দিতে। তাই দিরহামের চিন্তা তিনি করেন নি। তিনি সাথে সাথেই রাজী হয়ে গেলেন, দু'শো দিরহামেই তাকে কিনে নিলেন। তখন তার বুকের ওপর থেকে তপ্ত পাথর সরানো হল। তার সবগুলো বাধন খুলে দেয়া হলো। তাকে টেনে তোলা হলো। মহানবীর (সা.) পালিত পুত্র যাইদ (রা.) (যিনি নিজেও প্রথমে ক্রিতদাস ছিলেন) বেলাল (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'বেলাল! গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে গেছে।' হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে গেলেন। একটানা পাঁচদিন মরণাপন্ন থাকার পর যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন

আবু বকর (রা.)-এর খুশী আর ধরে না। এতদিন তিনি দিন রাত বেলাল (রা.)-এর সেবা করেছেন। তিনি বেলাল (রা.)-কে জানালেন বিশ্বজগতের জন্যে প্রেরিত আল্লাহ্‌র রহমত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনদিন বেলাল (রা.)-এর বিছানার পাশে বসে কাতরভাবে আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্যে দোয়া করেছেন। যখন বুঝেছেন যে তাঁর বেঁচে ওঠার পথে আর তেমন বাধা নেই তখনই তিনি সেখান থেকে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, 'বেলাল! আমি জীবনে তোমার মত ভাগ্যবান মানুষ দেখি নি।'

দাস জীবনে যিনি মানুষের মর্যাদা পান নি, সেই বেলালকে ইসলাম শুধু মানুষের মর্যাদাই দেয়নি বরং সে যুগের অর্ধেক দুনিয়ার অধিপতি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) তাকে এতই সম্মান করতেন যে তাকে 'সম্মানিত নেতা বেলাল' এই নামে সম্বোধন করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়ায্‌যিন (যিনি নামাযের সময় আযান দিয়ে সবাইকে নামাযের জন্যে ডাকেন)। তিনি ছিলেন সেই বেলাল (রা.) মক্কা বিজয়ের সময় যার হাতে ছিল বিজয়ী ইসলামের ঝান্ডা এবং যাঁর পেছনে ছিল মুসলিম বাহিনী। জগতের সব মানুষকে সব রকমের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে প্রেরিত মাহনবী (সা.) সেদিন ঘোষণা করেছিলেন– যে বেলালের ঝান্ডার নীচে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোন দাস এর আগে এ মর্যাদা পায় নি। আমরা সেই ধর্মে বিশ্বাসী যেখানে সব মানুষের অধিকার সমান। কোন মানুষের বংশ মর্যাদা কি বা তার গায়ের রং কি? এটা মানুষের বড় পরিচয় নয়। বড় পরিচয় হলো সে মানুষ কিনা। আমরা তাই মানুষে মানুষে অযথা কোনই ভেদাভেদ করব না। কাউকে ঘৃণা করব না। প্রতিটি মানুষেরই মর্যাদা আছে। সে যত দরিদ্রই হোক না কেন, যত সামান্য কাজই করুক না কেন, তার মর্যাদা যেন আমরা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা না করি। দুনিয়ার সব মানুষকেই আমরা তাই মর্যাদা দেবো। কাউকেই বিদ্রুপ করব না। কারণ চেহারা কুৎসিৎ হওয়া বা দরিদ্র হওয়াটা মোটেই দোষের নয়। আর চেহারায় মানুষ বড় হয় না– বড় হয় গুণে।

সেরা ছেলের সেরা মা

শতাধিক বছর আগে ভারতের পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত এক গ্রামে বাস করতেন একজন পুণ্যবতী মহিলা। নাম ছিল তাঁর নূর বখ্‌ত। তাঁর গুণের জন্যে সবাই তাঁকে সম্মান করত। তাঁর ছিল পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করে শোনাতেন আর বোঝাতেন ইসলামের শিক্ষা কত সুন্দর। সবাই এসে ভীড় করে তাঁর কথা শুনতো। তাঁর স্বামীও ছিলেন এমনই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যিনি পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন এবং দূরদূরান্ত থেকে পবিত্র কুরআন কিনে এনে তা লোকদের মাঝে বিলিয়ে দেয়াতেই ছিল তাঁর আনন্দ। এই মহিয়ষী নারী শুধু জ্ঞানবতীই ছিলেন না, মহাসৌভাগ্যবতীও ছিলেন। তাঁর গর্ভে আল্লাহ্ এমন এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। এই মা'ই ছিলেন সেই সন্তানটির প্রথম শিক্ষাগুরু। শিশুটি বড় হয়ে মহাজ্ঞানী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিল এই মায়েরই কাছে। মায়ের একান্ত অনুগত এই ছেলেটির ছিল মায়ের প্রতি বুকভরা ভালবাসা। বড় হয়েও তিনি ব্যকুল হয়ে স্মরণ করতেন তাঁর মহিয়ষী মা'কে। দুনিয়ার সব সুসন্তানই এভাবে সম্মান করেন তাঁদের মা'কে। মায়ের ঋণ শোধ করার সাধ্য আল্লাহ্ এই দুনিয়ার কোন মানুষকেই দেন নি। তাই এজগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন– 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।' মায়ের আদরের এই ছেলেটি বড় হয়ে হয়েছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)। তিনি (রা.) তাঁর শেষ জীবনেও বলতেন যে, পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ তাঁর মায়ের দুধের মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে এসেছে। কত মূল্যবান কথা বলেছিলেন পুণ্যবতী মায়ের এই পুণ্যাত্মা ছেলে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্যাত্মা ছেলেরাও সব সময় স্মরণ করতেন তাঁদের মায়ের স্নেহ এবং দয়ার কথা। আসলে মায়ের স্নেহ ছাড়া আমরা কি বেড়ে উঠতে পারতাম? কখনোই নয়।

পাঞ্জাবেরই আরেক পুণ্যবতী মায়ের কথা শোন। তাঁর নাম ছিল হুসেন বিবি। তিনি ১৮৬৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এতই পুণ্যবতী

ছিলেন যে, নিয়মিত রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) দেখতেন। তিনি আল্লাহ্‌র এতই প্রিয় বান্দা ছিলেন যে, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সাথে ইলহামের মাধ্যমে কথা বলতেন। সেসময় আল্লাহ্ দুনিয়ার মানুষকে রক্ষার জন্যে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে। ১৯০৪ সালে এই পুণ্যবতী মা'এর দেখা একটি স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে তাঁর ছেলে লিখেছিলেন, "একবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন রাস্তার লোকজন খুব তাড়াহুড়ো করে চলছে। সবাই তাদের সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে একই দিকে যাচ্ছে। মা ভাবলেন তারা কোন বিশেষ মহতী অনুষ্ঠান দেখতে যাচ্ছে। তিনি বাবাকে বললেন চলুন আমরাও আমাদের গাড়ী নিয়ে যাই। বাবা রাজী হলেন। তাঁরা রওয়ানা হলে পথে বাবার বন্ধু উকীল চৌধুরী মোহাম্মদ আমীন তাঁর বাসা থেকে বাবাকে ডাক দিলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। মা যেন একাই এক বিরাট মাঠের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে আরো লোকজন জমায়েত হচ্ছিল। বহুলোক সেখানে জমা হয়ে গেল। অনেকে গাছে উঠতে শুরু করল। ঐ জনতার মাঝখানে কিছুটা জায়গা ফাঁকা ছিল। ঐ ফাঁকা জায়গায় একটি ঢাকনা দেয়া দোলনা ঝুলছিল। দোলনার দড়িগুলো যেন আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মা অনুভব করলেন দোলনায় যেন কেউ বসা আছেন। কিন্তু তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। ঐ মাঠের একদিকে গ্যালারীর মত দেখা যাচ্ছিল। আর মধ্যে মাত্র দু'টি আসন খালি ছিল। মা সেখানে গিয়ে একটি আসনে বসলেন, আর অন্য আসনটি বাবার জন্যে দখল করে রাখলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন বাবা কিছুক্ষণ পরে এসে উপস্থিত হবেন। তখন দোলনাটি পূর্ব পশ্চিমে দুলতে শুরু করলো এবং এর ভেতর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল। যতই দোলনাটি জোরে জোরে দুলতে লাগল ততই তা থেকে উজ্জ্বলতর আলো ঠিকরে বেরুতে শুরু করলো। দোলনা যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকের লোকজন আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠছিল, 'স্বাগতম হে আল্লাহ্‌র নবী, স্বাগতম হে আল্লাহ্‌র নবী।' দোলনাটি দুলতে দুলতে যেন শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে গেল। আসলে এই স্বপ্নে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত পুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যে সত্য সেকথাই বুঝিয়েছিলেন। এই স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং এই মহিয়ষী মা প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই পুণ্যবতী মায়ের গর্ভে জন্মেছিলেন সব পবিত্র ছেলেমেয়েরা। তাঁর সবচেয়ে যোগ্য ও পবিত্রতম সন্তান ছিলেন হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)।

তিনিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। অসাধারণ মেধাবী এই সন্তান বড় হয়ে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি। তিনি সোমালিয়া, সিরিয়া ও জর্দান সরকারের কাছ থেকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছিলেন। এত সম্মান পেয়েও তিনি সবসময়ই মনে করতেন যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করাটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মা যেমন ভালবাসতেন এই সন্তানকে, দুনিয়ার অন্যান্য সেরা সন্তানের মতই সন্তানও তেমনই ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন তাঁর এই পুণ্যবতী মাকে। একবার এই মা তাঁর এই ছেলেকে বললেন যে, তিনি চিন্তা করেই পান না কেন এই ছেলে তাঁর এত বাধ্য। আর কেনই বা তাঁর সামান্য ইচ্ছেকে পূরণ করতে এত ব্যকুল হয়ে পড়েন। একথা শুনে তাঁর এই ছেলে বলেছিলেন– 'প্রথমতঃ এজন্যে যে, আপনি আমার মা, আল্লাহ্ আপনার কথা শোনা আমার জন্যে বাধ্যতামূলক করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আপনার অপরিসীম ভালবাসা, তৃতীয়তঃ আমার আশা আছে, আল্লাহ্র ইচ্ছেয় আপনি যখন বাবার সাথে মিলিত হবেন [তাঁর বাবাও ছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত সাহাবী হযরত নসরুল্লাহ্ খান (রা.)] তখন তাঁকে বলতে পারবেন যে, আমি পরিপূর্ণভাবে আপনার অনুগত ছিলাম এবং আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।' প্রগাঢ় আস্থার সাথে সেই মা বুকের ওপর হাত রেখে জানালেন যে, তিনি অবশ্যই তা করবেন।

সব সন্তানের সাথেই মায়ের সম্পর্ক এমন গভীর হওয়া উচিত। আমাদেরও উচিত এভাবেই বাবা মাকে সম্মান করা ও ভালবাসা। তাই সবাই বাবা মা'র কথা মেনে চলব। যদি আমরাও এমন বড় হতে চাই তবে সবসময়ই খেয়াল রাখব যেন আমাদের কোন কথাতেই বাবা মা এতটুকুও কষ্ট না পান।

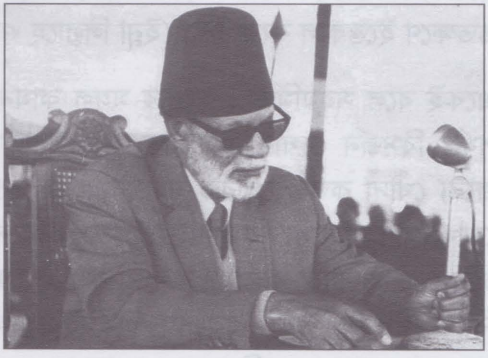

হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)

প্রেম ও সহমর্মিতা

হযরত রসুল করীম (সা.)-এর যুগে এক যুদ্ধে মুসলমানদের চোখ লক্ষ্য করে খ্রিষ্টানদের নিক্ষিপ্ত তীরে একে একে মুসলমানরা শহীদ হচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে ব্যকুল হয়ে হযরত ইকরামা (রা.) ৬০ জন সঙ্গীসহ শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁরা এত প্রচন্ড আক্রমণ পরিচালনা করলেন যে, শত্রুপক্ষের সেনানায়ক পালিয়ে গেল এবং শত্রু সৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষে মুসলিম সেনারা যখন ইকরামা (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা দেখলেন যে, হযরত ইকরামা (রা.) মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁকে পানি পান করার জন্যে সামনে পানির পেয়ালা ধরা হলে তিনি দেখলেন হযরত সোহেল বিন নোমান (রা.) তাঁর পানির পেয়ালার দিকে তাকিয়ে আছেন। যিনি পানি পান করাতে এসেছিলেন তাঁকে তিনি বললেন, 'প্রথমে সোহেল (রা.)-কে পান করান। পরে আমি পান করব। আমার এক ভাই আমারই পাশে পিপাসার্ত পড়ে থাকবে, আর আমি তাঁকে দেখে পানি পান করব এটা হতে পারে না।' তখন সেই যোদ্ধা হযরত সোহেল বিন নোমান (রা.)-এর কাছে গেলেন। তাঁর পাশেই আহত অবস্থায় পড়েছিলেন হযরত হারিস বিন হিশাম (রা.)। তিনি হারিস (রা.)-এর পাশে গেলেন। ততক্ষণে হযরত হারিস (রা.) ইন্তেকাল করেছেন।

তখন তিনি হযরত সোহেল (রা.)-এর কাছে গেলেন। তিনিও তখন ইন্তেকাল করেছেন। শেষে হযরত ইকরামা (রা.)-এর কাছে এলেন। তিনিও ততক্ষণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

একেই বলে সহমর্মিতা। অন্যের মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার এ দৃষ্টান্ত যুগে যুগে মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্যে খোদা কর্তৃক প্রেরিত মহামানবদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই রেখেছেন। মানুষের কল্যাণই তাঁদের জীবনের মহানব্রত। নিজের জীবন চলে গেলেও তাঁরা মানুষের কল্যাণ করা থেকে, তাঁদের সুপথ দেখান থেকে বিরত থাকেন না। এযুগের এমনই এক মহাপুরুষের নাম হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ সাহেব (রা.)।

তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনবার্তা পান। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিখ্যাত ডুরান্ড কমিশনের সদস্য হিসেবে আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারনকালে ১৮৯৪ সালে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা 'আয়নায়ে কামালতে ইসলাম' নামের বইটি তাঁর (আ.) একজন সাহাবীর কাছ থেকে পান। এটি পড়ে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর তিনি মনে মনে বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলেন এবং বলেন যে, এই সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর জন্যে দুনিয়া অপেক্ষা করছে। অতঃপর তিনি বয়াত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আফগানিস্তানের খোশত্ এলাকা থেকে গিয়ে কিছুকাল কাদিয়ানে থাকেন। সেখান থেকে দেশে ফেরার সময় তিনি আফগানিস্তানের সংশোধনের জন্যে তাঁর রক্তদানের প্রয়োজনের কথাও বলেছিলেন। আফগানিস্তানে ফিরলে তাঁকে মিথ্যা কথা বলে রাজধানী কাবুলে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করা হলো। সে দেশের শাসকের হুকুমে তাঁকে এক মন চব্বিশ সের ওজনের শিকল দিয়ে কষে বাঁধা হলো। এ অবস্থায় তাঁকে চার মাস জেলে নির্যাতন করা হয় এবং বারবার হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে অস্বীকার করতে বলা হয়। প্রতিবারেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, জীবন থাকতে তিনি সত্য ত্যাগ করবেন না। অবশেষে সত্য ও মিথ্যের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে বিরোধীদের সাথে বিতর্কের ব্যবস্থা করতে বললেন। বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলো। বহুলোক বিতর্ক শুনতে এল। বিতর্ক চলাকালে তাঁকে ভয় দেখানোর জন্যে আটজন লোক তাঁর মাথার ওপরে তলোয়ার ধরে রইল। মৌলভীরা বিতর্কে তাঁর সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তাঁকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগল এবং কাফের কাফের বলে চিৎকার করতে লাগল। যুক্তিতর্কে পরাজিত এসব লোকেরাই তাঁকে মাটিতে পুঁতে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করল এবং তাঁর সন্তানদের গ্রেফতার করে নির্যাতন করতে লাগল। তাঁর সাথী হযরত আব্দুর রহমান সাহেবকেও জেলে ঢুকিয়ে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়া হলো। তাঁরা জানতেন যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মানা ছাড়া কিছুতেই জগতের মানুষের কল্যাণ হবে না। তাই তাঁরা প্রাণ দিলেন কিন্তু মানবজাতির সংশোধন ও কল্যাণ কামনা থেকে বিচ্যুত হলেন না। এজাতীয় দৃষ্টান্ত খোদার মনোনীত জামা'ত ছাড়া কোথাও দেখা যাবে না।

তোমরা দেখেছো চাষী তার জমিতে যে ফসলের বীজ বোনে সে গাছই জন্মায়। সে যদি তার জমিতে কোন ফসলের বীজই না বোনে তবে পুরো ক্ষেতটাই আগাছায় ভরে যাবে। মানুষের হৃদয়টাও তেমনই সুন্দর ফসলের জমি। কৃষকের ক্ষেতে যেমন বীজ না বুনলে ফসল ফলবে না এবং তাকে অনাহারে থাকতে হবে, তেমনই আমাদের হৃদয়ে যদি ধর্ম এবং আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও সহমর্মিতার বীজ বপন না করি তবে আমরা নিজেরা এবং মসগ্র মানবজাতি শুধুই ক্ষতিগ্রস্থ হবো, পৃথিবী অশান্তিতে ভরে থাকবে। তাই হযরত ইকরামা (রা.), হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর মত আমাদেরও আল্লাহ্র সৃষ্টি ও সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেম ও সহমর্মিতা থাকতে হবে। আমরা যুগ ইমামকে চিনেছি। তাঁর মাধ্যমে আমরাও খোদা তা'লা ও তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে ভালবাসতে শিখেছি। তাই কেউ নিজ অজ্ঞানতাবশতঃ আমাদের কষ্ট দিলেও আমরা তাদের জন্যে দোয়া করব ও তাদের মঙ্গল কামনা করব।

ভালবাসা ও আনুগত্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খেলাফত কালে একজন খ্রিষ্টান কাদিয়ানে এলেন। তিনি একটি বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাকে প্রবীন সাহাবী মুন্সী মুহাম্মদ আড়োঢ়া সাহেব (রা.)-এর সাথে কথা বলতে বললেন। সেই খ্রিষ্টান ভদ্রলোক তখন মসজিদে আসর নামাযের জন্যে অপেক্ষমান হযরত মুন্সী আড়োঢ়া সাহেবের সাথে দেখা করার জন্যে গমন করলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

হযরত মুনসী মুহাম্মদ আড়োঢ়া সাহেব (রা.)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মধ্যে তিনি কি পেয়েছেন এবং কেনই বা তিনি আহমদী হলেন? প্রশ্ন শুনে তিনি শুধু বললেন যে, আমরা তো ঐ চেহারার জন্যে কাঙাল ছিলাম, ঐ চেহারা.....। বলেই তিনি হু হু করে কাঁদতে লাগলেন কচি শিশুর মত। কিছুতেই এ কান্না থামতে চায় না। যুগ ইমামের প্রতি কি গভীর ভালবাসা! এমনই ঘটনা ঘটেছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জীবনেও। তাঁর খেলাফত কালে তিনি একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতার বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান। সবাই তাঁর জন্যে অস্থির হয়ে পড়লো। অথচ তিনি তখন অত্যন্ত উৎফুল্ল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, হযরত নুরুদ্দীন [প্রথম খলীফা (রা.)] ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছেন। এই স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হলো বলেই তাঁর এই আনন্দ। অথচ তিনি আহত হয়েছেন, তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে, সেদিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই।

যে সব পুণ্যাত্মা যুগ ইমামের সান্নিধ্যে এসেছেন। অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের অন্তর এমন ভালবাসায় পূর্ণ না হয়ে কি পারে? নীচে এমনই একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৮৮৪ সালের গরম কালের কথা। দিনটি ছিল পবিত্র রমজান মাসের ২৭ তারিখ এবং শুক্রবার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফজরের নামাযের পরে মসজিদে মুবারকের নিকটবর্তী একটি কক্ষে চারপাইয়ের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর এক প্রিয় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ সানাউরী সাহেব (রা.) তাঁর পা আস্তে আস্তে টিপে দিচ্ছিলেন। তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমস্ত দেহ হঠাৎ কেঁপে উঠল। তিনি (আ.) হযরত সানাউরী সাহেবের দিকে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত সানাউরী (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর পায়ে একটি লাল-কালির ফোটা যা এক্ষুণি পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল। তিনি এটি ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন এবং ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করলেন। এর পরই তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর (আ.) জামার ওপরও একটি বড় কালির ফোঁটা। এটিও একদম সদ্যই পড়েছে বলে মনে

হচ্ছিল। হযরত সানাউরী সাহেব (রা.) তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত ঘর ভালভাবে খুঁজেও কোত্থেকে এল তা বার করতে পারলেন না। তখন তিনি চারপাইয়ে বসে পুনরায় পা দাবাতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উঠে মসজিদে মুবারকে গিয়ে বসলেন। হযরত সানাউরী সাহেব (রা.) তাঁর (আ.) পেছনে বসে তাঁর কাঁধ টিপে দিতে লাগলেন। তিনি বারবার অনুরোধ করাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিল তা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি ছিল এরকম– এক জাগ্রত স্বপ্নে তিনি চমৎকার এক বিশাল বাড়ী দেখলেন। সেখানে একটি সুদৃশ্য আসনে এক চিত্তাকর্ষক অস্তিত্বকে তিনি সমাসীন দেখতে পেলেন, যিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) নিজেকে সেই ঐশী প্রাসাদের কর্মকর্তা হিসেবে দেখলেন। তিনি কিছু আদেশনামা লিখে তাতে স্বাক্ষরের জন্যে সর্বশক্তিমানের সামনে পেশ করলেন। তাঁকে তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই সুদৃশ্য আসনে বসার জন্যে অত্যন্ত স্নেহের সাথে আমন্ত্রণ জানালেন, এরপর মহান আল্লাহ্ তাঁর কলমকে লাল কালির দোয়াতে চুবিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে স্বাক্ষর করলেন। যে লাল ফোঁটাগুলো হযরত সানাউরী (রা.) দেখলেন তা ছিল সেই কালির ফোঁটা যা স্বয়ং খোদা তা'লার কলম ঝাঁকানোর ফলে ঘটেছিল। তিনি হযরত সানাউরী (রা.) সাহেবকে আর কোথাও কোন কালির ফোঁটা পড়েছে কিনা তা দেখতে বললে হযরত সানাউরী সাহেব (রা.) অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, এর একটি ফোঁটা তার নিজের টুপিতেও পড়েছে।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক কাপড়সহ হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানাউরী (রা.)

এই ঘটনায় তিনি এতই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় যুগ ইমামের কাছ থেকে এই কাপড়গুলো চেয়ে নিয়েছিলেন এবং ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে (শুক্রবার) তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত জীবনের ৪৩ টি বছর তা সবসময় কাছে রেখেছেন। যেখানেই গিয়েছেন ঐ কাপড়গুলো সাথে রেখেছেন, কখনো এগুলোকে হাত ছাড়া করেন নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই শর্তে তাঁকে কাপড়গুলো দিয়েছিলেন যেন, হযরত সানাউরী সাহেবের ইন্তেকালের সাথে সাথে এই কাপড়গুলোকেও সমাহিত করা হয়। যাতে মানুষ এই কাপড়ের পুজো আরম্ভ করার সুযোগ না পায়। সেই অনুযায়ী তাঁর সাথে এই বস্ত্রও সমাহিত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই সাহাবী তাঁর সাথে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহাবিশ্বস্ততা রক্ষা করেছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য হিসেবে আমাদেরও যুগ ইমাম এবং তাঁর খলীফার প্রতি সেই রকম ভালবাসা ও আনুগত্য পোষণ করা উচিত। জীবনের সব কিছুর চাইতেই তাঁর আদর্শ ও শিক্ষাকে বেশি ভালবাসা উচিত। কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছিলেন অন্ধাকারাচ্ছন্ন এই যুগের একটি অনন্য ঐশী আলোকস্তম্ভ এবং শ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসুল করীম (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি।

সমাপ্ত

তথ্য নির্দেশ

১। তাজকিরাতুশ্ শাহাদাতাঈন– হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

২। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বিভিন্ন খুতবা

৩। Durri Manthur- Hazrat Miza Bashir Ahmad (R.)

৪। Durri Makhnun- Hazrat Miza Bashir Ahmad (R.)

৫। Hazrat Maulvi Nooruddeen Khalifatul Masih-1 (R.)– Muhammad Zafrulla Khan (R.)

৬। My Mother– Muhammad Zafrulla Khan (R.)

৭। The Red Drops by A. R. Dard- Ther Review of Religions, September 1988

৮। মুসলেহ্ মাওউদ– মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

৯। হায়াতে তাইয়েবা– আব্দুল কাদের (বাংলা অনুবাদ)

১০। Bilal (May God be pleased with him) by Hassan Mudammad Khan, The Muslim Herald, March 1981

১১। আহমদীয়াত– মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ মরহুম

১২। ইসলামের ইতিহাস– অধ্যাপক কে. আলী

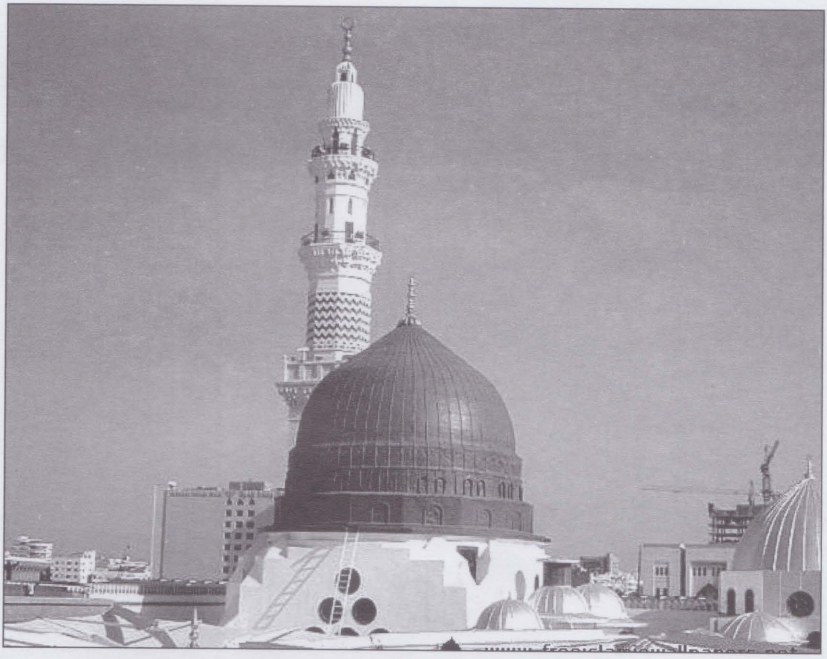

মসজিদে নববী, মদীনা

Amor Ziboner Kicchu Katha

By

K. M. Mahmudul Hassan

Published by:

Lajna Imaillah, Bangladesh

4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211